শাশ্বত সপ্তপদী

বৃষ্টিটা হঠাৎই এসে গেল, ছাতা ব্যাপারটা একমাত্র বৃষ্টির সময়ই মানায়, নয়তো অন্য সময় ভয়ানক আনস্মার্ট। বাস থেকে নেমে গেট পর্যন্ত পৌঁছতে বেশ একটু ভিজে যায় তুতুল। ব্যস্তহাতে কলিংবেল টেপে। ভিতরে মনে হচ্ছে বেশ একটা শোরগোল, কে এল? ছোটমামা দরজা খুলে দিতেই নাকে এল মুস্কিপাতি জর্দার গন্ধ, সারা বাড়িটাই বোধহয় এই গন্ধে ভরে গেছে। আর বলতে হবে না, যাঁর এই জর্দা - বিলাস তিনি আর কেউ নন— মায়ের দিদিমা— ওরা বলে খুকুদিদা। তার মানে আজ বাড়িতে একটা এলাহি কাণ্ড! সবে এগারো ক্লাসে ভর্তি হয়েছে তুতুল, সায়েন্স নিয়ে পড়ে। অঙ্কটা একটু ভাল-না করলে জয়েন্টে কিছু হবে না। ছুটির দিনেও তাই ও অঙ্ক স্যারের কাছে যায়। ছোট মাসির মত ওকেও ডাক্তার হতে হবে। জিনসের প্যান্টটা পায়ের দিকে সম্পূর্ণ ভিজে গেছে, তাড়াতাড়ি ছেড়ে ফেলে শুধু বারমুড়া গলিয়ে নেয়, গেঞ্জিটা তত ভিজে লাগছে না। ছাঁটা চুলে তোয়ালের ঘসতে ঘসতে খুকুদিদার কাছে হাজির। ওখানে যাকে বলে একেবারে চাঁদের হাট বসে গেছে। দিনটাও ভারি সুন্দর। ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া, মাঝেমধ্যে বৃষ্টি। বাইরে বেরিয়ে যদি ঘোরাঘুরি না করতে হয় তবে এমন দিন আর হবে না।

মুখে একখিলি পান গুঁজে ধীরে সুস্থে জর্দার কৌটোটা খুলে অনেক যত্নে একটিপ জর্দা তুলে মুখে ফেলার আগে তুতুলকে দেখে খুকুদিদি বললেন—জলে ভিজেছিস নাকি? —হ্যাঁ-না' ধরনের কি একটা বলে মহা আগ্রহে ও বলল— ওমা, তোমরা কখন এলে? আজ জানলে আর পড়তে যেতাম না। শুনে ওদের খুকুদিদা মানে সর্বসুন্দরী দেবী বললেন— পড়তে যাবি না কেন? একি আমাদের কাল আছে? এখন তোদের কত কাজ, কত দায়িত্ব। পড়তে হবে বৈকি! কালের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে হয় রে। তবে দেখ, সব কিছু পালটে যাচ্ছে, যেতে বাধ্য কিন্তু একটা জায়গায় আমরা স্থির দাঁড়িয়ে, নট নড়নচড়ন। তুতুলের সঙ্গে ওদের মামাতো দু'বোন রুমকি ঝুমকি গলা মিলিয়ে চেঁচিয়ে বলে—সেটা কি? কি জিনিস একজায়গায় আছে, পাল্টায়নি? ওদের কথাগুলো সকলেরই কানে গেছে। খুকুদির বুড়ো দুই ছেলে, বউ, জামাই, আধবুড়ো মেয়েরা আর একেবারে সিংগজানো নাতি-নাতনি, একটি দুটি পুতি— সবাই শোনবার জন্য ওঁর দিকে তাকায়। ওঁর কোনও তাড়া নেই, নিজের দাঁত দিয়েই কিছুক্ষণ পান চিবিয়ে এবার হাসিমুখে বলেন— উত্তরটা জানিস না তো? কেন বল তো? বেশি সোজা না বেশি কঠিন? কেমন একটু অদ্ভুত হেঁয়ালি পেয়ে বসেছে বুড়িটাকে! বুড়ি? তাড়াতাড়ি নিজেকে ঠিক করে নেয় তুতুল। চুরাশি বছর বয়স হয়েছে নাকি? ফর্সা হলদেটে গায়ের রং। খোঁপা খুলে ফেললে সাদা চুলের রাশ কোমর ছুঁয়ে ফেলে। গোলালো হাতে সাদা শাঁখা, লাল রুলি আর সোনার চুড়ি কগাছা। লালপাড় সাদা শাড়িতে ঘোমটা দেওয়া মুখখানা কেমন দেবীর মত পবিত্র দেখায়। আজ সবার জন্য আবার নিজেই রান্না করবেন! ওদের হাঁ-করা মুখগুলো দেখে এবোর হেসে ফেলে খুকুদিদা বলেন— পারলি না তো? এক জায়গায় যা দাঁড়িয়ে আছে, একটুও বদলায়নি, তা হচ্ছে নরনারীর ভালবাসা, তোরা যাকে বলিস প্রেম। শুনে ওঁর বুড়ো ছেলেরা চোখ নামিয়ে নেয় আর বাতব্যাধিগ্রস্ত বড় বউ চাপা গলায় বলে —ভীমরতি!

কিন্তু ওঁর নাত-নাতনিরা, পুতিরা সব যুবক - যুবতী, কিশোর - কিশোরী, ওদের অনেক উৎসাহ - কৌতূহল আর জিজ্ঞাসা। ওরা বিভিন্ন জায়গায় থাকে, এমন দিনে একসঙ্গে হতে পেরেছে, গল্পই তো জমবে ভাল। টাপুর টুপুর দুই যমজ বোন ফিসফিস করে তুতুলের সঙ্গে আলোচনা করে নেয়। তারপর বলে —লাঞ্চের আগে মেঘলা দিনে প্রেমের গল্পই ভালো হবে, আর সন্ধ্যের পর ভুতের গল্প। বলামাত্রই রিটার সমর্থন জুটে যায়। আজকালের শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা মা - বাবার সঙ্গে যে কোনও বিষয় নিয়েই আলোচনা করে, কোনও কিছুই নিষিদ্ধ নয় বরং মা-বাবা সক্রিয় অংশ নেন এসব আলোচনায়। ভিতরের খুশি মুখে উপচে পড়ে সর্বসুন্দরীর। ছেলেমেয়েগুলোর মধ্যে ওঁর আদল বেশ বোঝা যায়—কারও বা গায়ের রং-এ, কারও চুলে বা মুখের গড়নে। উনি বলেন— তবে শোন। আমাদের কালে এখনকার মত ছিচকে প্রেমের কোনও স্থান ছিল না—

—অবজেকশান! বলে ওঠে নেবু, যার ভাল নাম নবেন্দু, বি.ই.ইলেকট্রনিক্স ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র।

—কেন, আপত্তি কেন? সব প্রেমই কি এরকম নাকি? তাদের জাতপাত আলাদা, ধর্ম আলাদা, তারপর আছে তার বিবর্তন!—

—ইভলিউশনারি লাভ। বিড়বিড় করে বলে দর্শন অনার্সের ছাত্রী রংলি।

—এখনকার প্রেমগুলো মোটামুটি এইরকম—আগেই বলেছি ছিঁচকে প্রেম। তার সঙ্গে হামেশাই দেখতে পাই হাভাতে প্রেম, প্যানপেনে প্রেম, পত্রপ্রেম, মিত্রপ্রেম—

—প্লিজ খুকুদিদা, শুধু তোমায় পেরমের কথাটাই আজ নাহয় বলো— বলে রংলির দাদা জলি, যে এখন ম্যানেজমেন্ট করছে।

—তবে গোড়া থেকেই শোন। দেশ তখনও ভাগাভাগি হয়নি, মানুষগুলো গরিবই হোক আর বড়লোকই

হোক, সুখী ছিল। কারও বিশেষ কিছু চাহিদা তো ছিল না। গরিব লোকগুলো শুধু খেতে পেলেই খুশি, যে কোনও সচ্ছল বাড়িতে কিছু একটা কাজ টেনে নিয়ে করলেই পেট ভরে খাওয়া, কিছু পয়সা- চাল নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারত। বেশির ভাগ পরিবারে জমিজমার আয় তো ছিলই, এর ওপর যদি দু-একটি ছেলে চাকরিবাকরি করত তো সবাই তাদের বড়লোক বলেই মনে করত। অবশ্য সব পরিবারই একধরনের নয়, কূপমন্ডুকতাও ঢের ছিল কিন্তু ঠাকুমার আগ্রহে আমাদের বাড়িতে লেখাপড়ার চর্চা কেবল ছেলেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, মেয়েরাও পড়াশুনা করত। তবে উচ্চশিক্ষার জন্য মেয়েরা শহরে যেতে পারত না ছেলেদের মত। তখন বাড়িতে লেখাপড়া করে প্রাইভেটে পরীক্ষা দেওয়া চলত, পিসিমা একজন এইভাবে পরীক্ষা দিয়ে বি.এ. পাশ করেছিলেন।

ভাইবোনদের মধ্যে আমি ছিলাম চতুর্থ আমরা মোট আট ভাইবোন—। ঠাকুমা-পিসিমারা বলতেন, আমি আমার মায়ের গায়ের রং-ও পাইনি, মুখশ্রীও পাইনি— আমার অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না। তুতুল থাকতে না পেরে বলে —তোমার মা তোমার চেয়ে ফর্সা, সুন্দরী ছিল? আমরা তো সে তুলনায় ভূতের বাচ্চা সব! ওর মায়ের গায়ের রং বেশ চাপা, তাই হয়তো যথেষ্ট বিরক্ত হয়ে বলে —চুপ কর তো খালি বকবক। সেদিকে আড়চোখে চেয়ে খুকুদিদা বলে চলেন— বেশ খাইদাই, গাছে চড়ে আম, জাম, তেঁতুল, কামরাঙা, গাব, পেয়ারা, কুল, কাঁচা পাকা যা পাই দল বেঁধে খেয়ে বেড়াই। মার শাসনে পড়াশুনাও করতে হয়। তখন ইংরাজি বই ছিল প্যারীচাঁদ মিত্রর ফার্স্টবুক। আমি ঘোড়ার পাতায় পৌঁছেছি। আই মেট এ লেম ম্যান ই এ লেন ক্লোজ টু মাই ফার্ম। একপাতা মুখস্ত করতে বেশিক্ষন লাগত না। দুপুরবেলা ইংরাজি বাংলা হাতের লেখা করতে হত, ফলে দু-এক পাতা পড়ার পর প্রচুর সময়, তখন যাকে বলে একেবারে মুক্তজীব। বাড়িতেই সমবয়সী কয়েকজন কিন্তু পাড়ায় ঘুরে বেড়াতেই বেশি মজা। ছ-হাতি আটহাতি সব জোলার বোনা শাড়ি পরে ঘুরে বেড়াতাম নদীতে সাঁতার কাটতাম। এক-জনের আবার কি লম্বা চুল। গাছে চড়া, সাঁতার কাটায় আমাদের ওই পোশাকে কোনও অসুবিধা হত না। আর এখন তোদের দেখি চুল একটু লম্বা হলেই গা কুটকুট করে— তাই না? নাতবউ -এর হাতটা বোধহয় তার অজান্তেই মাথায় উঠে যায়। বব চুলে হাত বুলিয়ে নিয়ে কুখটা হাঁড়ির মত করে বসে থাকে। কিন্তু তুতুলের দলের উৎসাহে উনি আবার বলতে থাকেন—সেদিন হিমু মানে হেমনলিনীর বাড়ি থেকে এক কোঁচড় করমচা পেয়েছি, প্রায় লাফাতে লাফাতে ফিরছি। রোদে ঘেমে গেছি। হাতখোঁপায় বাঁধা চুল খুলে গেছে , দুহাতে কোঁচড় ধরা চুলটা আর বাঁধতে পারছি না। তেঁতুলতলা বেলতলা পেরিয়ে বাড়ি ঢুকতে হবে। দোষ লাগে জানি, কিন্তু কি করি। এমন সময় দেখি মস্ত লম্বা চওড়া একজন মানুষ আমার সামনে, বলছেন—চৌধুরী মশায়দের বাড়ি এইদিকে, খুকি? খুব রাগ হল, বললাম—আমার নাম সর্বসুন্দরী, আর সবাই আমাকে সবু বলে ডাকে, আমি ওই বাড়ির মেয়ে। এখানে যদি যেতে চান আমার সঙ্গে আসুন, বলেই লম্বা লম্বা পা ফেলে যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরলাম। কাছারিঘরে জ্যেঠামশাই, বাবা আরও সব লোকজন। দুহাতে কোঁচড় ধরা অবস্থায় বাবার সামনে এসে বললাম—এই যে ইনি চৌধুরী বাড়ি খুঁজছেন, তাই নিয়ে এলাম। বাবা, জ্যেঠামশাই ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন, বোধহয় লোকটাকে চেনে। নিশ্চিন্ত মনে বাড়ির মধ্যে চলে গেলাম।

।। দুই।।

এবার বেশ জোর বৃষ্টি নেমেছে। ইতিমধ্যে বড়বউ কিসব ভাজা মুখরোচক খাবার বানিয়ে এনেছে। কফির সঙ্গে চলছে এসব, ছোটরাও বাদ নয়। গল্প জমে উঠেছে। আর একখিলি পান মুখে গুঁজে খুকুদিদি ফের শরু করেন— ওই ঘটনার তিন মাসের মধ্যেই ওই ভদ্রলোকের তৃতীয় ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল।

—ওমা, সেকি? মেয়েগুলো হইহই করে ওঠে— তোমার বয়স তো ভীষণ কম! অত অল্প বয়সে বিয়ে দেয় নাকি, সরকারি নিয়ম কিছু মানত না লোকে?

—তোদের সরকার -এর আর বয়স কত, সেই কি সাবালক হয়েছে? সব চলত, এখনও চলে। বরং গৌরীদান - টান আমাদের হয়নি। আমার বয়স চোদ্দর মত, তখনকার তুলনায় বেশ বড়সড়ো। তা বিয়ে হবে শুনে ভালোই লাগছিল, কত শাড়ি গয়না হবে, কত লোকজন, খাওয়া - দাওয়া। কত আনন্দ হয় দেখেছি তো দিদিদের বিয়ের সময়। হঠাৎ সবাই আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে লাগল, কেউ আর বকে না দেখে ভারি অবাক হয়ে গেলাম। বড়দের কথায় বুঝলাম খুব মেধাবী ছাত্র নাকি হবু বর, তার ওপর দেখতেও খুব সুন্দর—একেবারে রাজপুত্রের মত! শুনে মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। রাজপুত্র মানে তো ঝাঁকড়া চুল আর বাবুকার্তিক মার্কা গোঁফ।

সারাদিন যারা লেখাপড়া করে তারা কাঁচা আম বা কাঁচা তেঁতুল কখনও খায় না। তারপর শুনছি কলকাতায়

পড়ে। তার মানে সাঁতার কাটতেও জানে না। —এমন লোক আর আমার কি কাজে লাগবে। যেটুকু উৎসাহ হয়েছিল সব মাটি হয়ে গেল। বিয়ের দিনটাও ঠিক মনে নেই। অনেক লোকের ভিড় আর চেঁচামেচি, হ্যাজাকের আলো, রান্নার গন্ধ, খাওয়া - দাওয়ার চিৎকার। কিছুই খেতে দেয়নি আমাকে। খিদের জ্বালায় অস্থির হয়ে পড়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। অনেক চেঁচামেচি কানে এল। কারা আমাকে পিঁড়ির ওপর বসিয়ে ঘোরাতে লাগল। ঘুমে চোখ চাইতে পারছি না। চিৎকার, জোর আলো, উলু, শাঁখ—ধাক্কা দিয়ে দিয়ে কে বলছে তাকা তাকা। তাকিয়ে দেখলাম ড্যাবডেবে চোখে ধুচুনির মত টোপরপরা একজন, সে কেমন, কিছুই বুঝলাম না—

—খুকুদিদা, এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না। আমাকে বুড়োদাদুকে কি সুন্দর দেখতে, ঠিক রবীন্দ্রনাথের মত, আর তুমি তাঁর নিন্দা করছ। ছোট মামিমা বাংলার এম.এ., উনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—আরে তোরা এসব বুঝবি কি? এর নাম ব্যজস্তুতি অর্থাৎ নিন্দাচ্ছলে প্রশংসা।

—সে তোরা যাই বলিস, আমি সেই সময়ের কথা বলছি, তোরা যা দেখিসনি, জানিস না। ওই ঝামেলার পর ঘরে বসিয়ে সব কজন বুড়ি মিলে কি যে সব আদিখ্যেতা শুরু করল, কি বলব। কোথা ভালো করে খেতে দেবে, ঘুমোতে দেবে, তা নয়। সব রাগ গিয়ে পড়ল বরের ওপর, ওর একেবারেই ঘুম পায়নি, আর বুড়িদের সঙ্গে কটুর কটুর গল্প হচ্ছে আর মুচকি মুচকি হাসতে, ভারি যেন মজা। কতক্ষণ বাদে খেতে দিল, সে যা খিদে! গোগ্রাসে খেয়ে ফেললাম। বুড়িদের আমোদের যেন শেষ নেই, তারা সব নাচ আর গান শুরু করেছে, একদম শোনার মত নয়, একটু বাদেই ঝিমুনি এসে গেল, কাত হয়ে শুনে পড়লাম। মাথায় কে একটা তাকিয়ে ঠেলে দিল, পরে শুনেছি ওটা নাকি বর।

—বাঃ দারুণ রোম্যান্টিক তো! বলে ওঠে নেবু, —নিদ্রিতা নববধূকে বালিশ প্রদান!

—ঠিক বালিকা বধূর মত, ছোটমামা বলে ওঠেন।

—তোদের বালিকা বধূর রোম্যান্স তো আজগুবি কিছু নয়, জীবন থেকেই নেওয়া। তারপর কি হল শোন। মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় খুব কান্নাকাটি করে সবাই। দুপুর থেকেই এই রকম চলছে। আমি শক্ত হয়ে আছি আমার মায়ের কথা ভেবে। দু দিদি শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় কনকাঞ্জলির নামে খানিকটা মাটি-কড়ি আর খই মার আঁচলে দিয়ে যেই বলেছে। এতদিন যত খাইয়েছ পরিয়েছ সব ঋণ শোধ করে দিলাম— মা অমনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। জ্ঞান ফেরানোর জন্য অনেক চেষ্টা করতে হয়েছিল। এদিকে মেয়ে - জামাই রওনা করানো, ওদিকে মায়ের ওই অবস্থা। এসব মনে করে আমি একটুও কাঁদিনি, মনে মনে ঠিক করে রেখেছি এসব ব্যাপার নিশ্চয়ই পুজোর অঙ্গ নয়, তাই আমি ওসব কিছুই বলব না, এতে কারও আপত্তি হবার কথা নয় অন্তত। এদিকে অনেকে কানাকানি শুরু করেছে —ধাড়ি মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাবার জন্য যেন মুখিয়ে আছে। একটু যদি চোখে ওর জল আসে, বেহায়ার হদ্দ ইত্যাদি। পালকি এসে গেছে, খাওয়া-দাওয়ার পরই রওনা হতে হবে। একটু ভয় করছিল, বাবা যদি ধমক দেন। যাই বলুন আমি ঠিক করেছি বলবই। বাবাকে জ্যেঠামশাই পিসেমশাই-এর সামনেই বললাম, বাবা, ওই যে মাকে বলতে হবে তোমাদের সব ঋণ শোধ করে দিলাম— আমি তা কিন্তু বলতে পারব না। মা - বাবার ঋণ একমুঠো মাটি দিয়ে শোধ করা যায় না, তুমি আমাদের সে শিক্ষা দাওনি। বাবা প্রথমটা অবাক হয়ে গেলেন, বললেন যে, ওসব আচার - নিয়ম কতকাল ধরে লোকে পালন করে এসেছে। পাশ থেকে শাসনের সুরে পিসেমশাই বললেন—তুমি ছোট, ছোটর মত থাক, এসব তোমাকে দেখতে হবে না। কি করব বুঝতে পারছি না, এদিকে মেনেও নিতে পারছি না। ওমা, ওই ভিড়ের মধ্যে বরও ছিল। সে এবার সামনে এগিয়ে এল, বলল— আপনার মেয়ে ঠিকই বলেছে, এ ধরনের নিষ্ঠুর প্রথা না মানাই ভাল। রাতের বেলা পিঁড়ি চড়ে যখন ওর গলায় মালা দিয়েছি বুঝতেই পারিনি মানুষটা বেশ লম্বা - চওড়া, চেহারাও ভালোই, এখন দেখছি বেশ মায়া-দয়া আছে, খবর পেয়ে বাড়ির মধ্যে নানারকম কথা হতে লাগল—মা তার নতুন জামাইকে আলাদা ঘরে নিয়ে গিয়ে কান্নাকাটি করে কিসব বলল। মা এবারে আর অজ্ঞান হননি, শুধু চোখের জলে বিদায় দিয়েছেন মেয়েকে।

এঁদের দেশের বাড়ি আমাদের গ্রাম থেকে মাত্র পাঁচ ক্রোশ দূরে। বাড়িটা আমাদের চেয়ে আরও বড়, আরও বেশি লোকজন। কথায়-বার্তায় বেশ একটা শহুরে ছাপ আছে। শাশুড়ি মহিলাকে বেশ ভালই লাগল তবে আমাদের বাড়ির মত সবার আচরণ এত খোলামেলা নয়, বেশ একটা চাপা চাপা ভাব। পুরুষরা প্রায় বাড়ির মধ্যেই থাকেই না এক অসুখ -বিসুখ ছাড়া। আর বউদের সঙ্গে তাদের দেখা হওয়া এক খাবার সময়। সবার সামনে কথা বলা তো এক গর্হিত ব্যাপার! রাতে কচিকাঁচাদের সঙ্গে আমি থাকি অন্য ঘরে। তোদের এই বুড়োদাদু তাই আমার সঙ্গে দেখা করার নানা ফন্দিফিকির খুঁজে বেড়াত। বড় পুকুরঘাট ছিল বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে। ওই পুকুরের জল মেয়ে - বউদের কলসি করে আনতে হত পুজো, রান্না, খাওয়া —এসবের জন্য। একদিনের কথা বলি। দল বেঁধে কলসি কাঁখে যাচ্ছি সব পুকুরে, হঠাৎ আমার কলসির গায়ে টুং করে শব্দ। কেউ নিশ্চয়ই ঢিল মেরেছে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি, দলের সবাই কথা বলতে বলতে এগিয়ে গেছে

ভাগ্যিস। ইনি গাছ থেকে ঝপাং করে লাফ দিয়ে নেমে আমার হাতে দুটো পেয়ারা গুঁজে দিয়ে আবার উধাও!— কি রে দাঁড়ালি কেন? কি হল? বড়মা পিছন ফিরে এগিয়ে আসতে লাগল। গাছের আড়াল থেকে মুখে আঙুল রেখে ইশারা করে উনি জানালেন কিছু যেন না বলি। তখড় তাড়াতাড়ি মাটিতে বসে পড়ে পেয়ারা দুটো ট্যাঁকে গুঁজে ফেলে তাড়াতাড়ি বললাম — বোধহয় কাঁটা ফুটেছে।

—দেখি?

—না না, আপনি পায়ে হাত দেবেন না। উঠে দাঁড়িয়ে বলি—এই তো বেরিয়ে গেছে। আমার সঙ্গে কথা বলার এত ইচ্ছে বেচারার অথচ কোনও সুযোগ নেই। আমার তো সারাদিনের কাজ একেবারে বাঁধাধরা। ঠাকুরঘরে ধোওয়া - মোছা, সাজানো, ফলমূল নৈবেদ্য ঠিক করা। কখনও রান্নাঘরে সবজি কাটাকুটি, জলখাবার দুপুরের খাবার সাজানো, সবাইকে দেওয়া। বিকালে খিড়কি পুকুরে সব মেয়ে বউ মিলে গা ধোওয়াটা ছিল খুব আনন্দের। নিজেদের মধ্যে হালকা কথা হাসিঠাট্টার একটা আড্ডা জমে উঠত। পাড়া ঘরের বউ - ঝিরা দু - চারজন আসত। পাশের বাড়ির মাধুরী ছিল এদের মধ্যে আমার বন্ধু। একদল তো গিন্নি-বান্নি হয়ে গেছে, দু-তিন ছেলেমেয়ের মা। তাদের একরকম গল্প। আরও সিনিয়াররা ছেলেমেয়ে বিয়ে দিয়ে শাশুড়ি বনে গেছে, তাদের একরকম গল্প। মাধুরী আমার চাইতে একটু বড়। এটা ওর বাপের বাড়ি, ওর স্বামী বিদেশে, ও চলাফেরায় সম্পূর্ণ স্বাধীন। চিঠিপত্র লিখে যে যোগাযোগ করা যায় আগে আমার মাথায় আসেনি। মাধুরী যেন বেশ মজা পেয়ে গেল। ওর মাধ্যমে মাঝে মাঝে ছোট ছোট কাগজ পেতে লাগলাম, তাতে হয়তো লেখা 'কুয়োতলায় অপেক্ষা করো'। তার ফলে গোটা কতক কলসি জোগাড় করে একের পর এক জল ভরে যাচ্ছি, হঠাৎ ঝড়ের বেগে কোথা থেকে এসে একটানে আমাকে একেবারে শূন্যে তুলে কয়েক পাক ঘুরিয়ে দিত। গোটা কয়েক পেয়ারা, নয়তো কামরাঙা, কতবেল যা হোক কিছু দিয়ে আবার উধাও। এসব কি করে সামলে খাই, সে ছিল এক সমস্যা। মাধুরী এসব ব্যাপারে খুব সাহায্য করত। যেন ও এসব এনেছে এইরকম ভাব দেখিয়ে দুজনে খেতাম। ছুটি ফুরিয়ে গেল। ও ফের কলকাতা চলে গেল। শ্বশুরমশাই আমাকে মায়ের কাছে রেখে এলেন। ডাকাতে প্রেমের হাত থেকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

।। তিন।।

—সেকি? সমস্বরে চিৎকার, দাদুর যথেষ্ট বিবেচনা ছিল তোমার প্রতি, আর তুমি কিনা! না না, খুকুদিদি এটা কিন্তু ঠিক নয়।

—বুঝলাম। তবে শোন, ওই তোদের 'টান' যাকে বলিস সেটা আসতে সময় লাগে। অত দুমদাম ঘটে না নাটক - নভেলের মত। সবার যে ওই টান আসবেই তার কোনও মানে নেই। আমার তো এলই না।

—যা বাব্বা! তবে এত বছর ধরে ঘর-সংসার ইত্যাদি, এসব কি? এর মধ্যে প্রেম নেই, তবে আছেটা কি? উত্তেজিত নেবু আর থাকতে পারে না। ওর মত অল্পবয়সী বাকিরাও ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না। চায়ও না। কেউ একজন একটু দেখা পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করবে না, কাউকে দেখবার জন্য ভিতরটা আনচান করবে না, একটু ছোঁওয়া পেলে ভিতরটায় তোলপাড় হবে না এমন দুর্দিন যেন সত্যি না আসে।

খুকুদিদি বলে চলেন—আরে সেটাই তো বলব তোদের। ওরা ভাবে—তবে দেখাই যাক সে আমলের ব্যাপার।

—এ বাড়ি ও বাড়ি যাওয়া-আসার মধ্যেই আরও বয়স বাড়ল, উনি ওকালতি শুরু করেছেন, দুটি ছেলের মা হয়ে গেছি। বুঝেছি গ্রাম্য জীবনের এইসব আড়ম্বর আর আচার - নিয়ম, এর মধ্যে আটকে থাকলে ছেলেরা মানুষ হবে না। প্রথমে ওঁকে বলতেই কেমন বিস্মিত হতভম্ব হয়ে গেলেন। এজমালি বাড়ির বাইরে যে থাকা যায় এবং মায়ের মতের বিরুদ্ধে যাওয়া যে চিন্তায় আনা যায়, তা এত ডাকাবুকো হলে কি হবে, ভাবতে পারত না। আমিই শ্বশুরমশাইকে বললাম শেষে— কলকাতায় একা একা মেসে থাকেন, পসার বাড়ছে, ঠিকমতো নাওয়া-খাওয়া হয় না আমার ওঁর কাছে থাকা উচিত। প্রথমটা অবাক হলেও যুক্তিটা মেনে নিলেন আর আমার যাতে কোনও কষ্ট না হয়— এই বাড়িখানা কিনে দিলেন। খানিকটা বাড়িয়ে - টাড়িয়ে নিয়েছি আমরা পরবর্তীকালে। কিন্তু এতখানি জমিসমেত বাড়ি সে আমলে দাম ছিল মাত্র ছ'হাজার টাকা। এদিকটা তখন প্রায় ফাঁকা ছিল। কতখানি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলাম শ্বশুরমশাই স্বীকার করেছেন যখন পার্টিশান হল। সবটা চলে গেল পূর্ব পাকিস্তানে, ছত্রভঙ্গ সমস্ত পরিবার— সে অবশ্য অনেক পরে।

নতুন জীবন শুরু হল, বুঝতেই পারছিস, মাথার ওপর কেউ নেই। অথচ মাত্র কিছুদিন আগেই সবার আড়ালে কখন একটু হাত ধরে বা আঁচল ধরে টানবেন সেই চেষ্টা করতেন। তখন আমিও ভাবতাম এখান থেকে একবার বের হই, ভালবাসার বন্যা বইয়ে দেব একেবারে। অথচ তেমন কিছুই ঘটল না। তার বদলে

আমি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম ছেলেদের ভালো স্কুলে ভর্তি করা, তাদের পড়াশুনা, খাওয়া - দাওয়া, যাতায়াত এইসব নিয়ে। উনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন মামলা - মোকদ্দমা, মক্কেল, নথিপত্র, জুনিয়ার—এদের নিয়ে। পরিধি বাড়তে লাগল, ওঁর এবং আমার। আরও তিনটি সন্তানের জন্ম, তাদের শরীর, স্বাস্থ্য, পড়াশুনা—ব্যস্ততা আর ব্যস্ততা। বড়ছেলে, মেয়ে—ওদের বিয়ে দেবার সময় এসে গেল। আরও দৌড়াদৌড়ি, দেখাদেখি, কথা বলাবলি চলতে লাগল যেমন হয় আর কি। কোথায় প্রেম? সে কি ছিল? কেবল একসঙ্গে থেকে সবার সব ভর কাঁধে নিয়ে দায়িত্ব পালন করে গেছি দুজনে। প্রতি শীতে লেপ - কম্বলের ওয়াড় ঠিক করা, বিছানা রোদে দেওযা আর বাড়ি, আচার বানানো, বসন্তে শীতের জিনিসপত্র সরানো আর গরম জামাকাপড় কেচে তোলা। গ্রাম্মে সকলকে ভাল রাখা যায় কি করে, এই চিন্তায় কাঁচা আমামের সরবত বানাই আর হালকা রান্নার জোগাড় করি আর বর্ষায় জামাকাপড় কেচে শুকানো।

—ওঃ, তুমি যে বারোমাস্যা শুরু করে দিলে, বলে ওঠে তুতুল। —তোমার সঙ্গে গোড়ায় কি কথা হয়েছিল? প্রেমের গল্প বলবে, তাই না?

—ঠিক ঠিক। আমাদের ভুলিয়ে - ভালিয়ে একেবারে কাঁথা - কাপড় কাচার মধ্যে এনে ফেলেছে, দেখেছিস! ধন্যি বটে তোমার বাহাদুরি—বলে নেবু।

—ঠিকই ধরেছিস। আমার বাহাদুরির বহর তো তোরাই। বলে হাসিমুখে একবার করে সবার মুখের দিকে তাকান। তাঁর এই বিরাট পরিবারের প্রত্যেকেই কৃতি, সুঠাম, সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী, একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল —এসব কিছুর উৎসাহ উনি; আদরযত্ন আর ভালোবাসায় গড়া সংসার। এবারে উনি বলেন—তবে শোন। আমি এত বছরে যা বুঝেছি তোদের বলি। প্রেম আর কিছু নয় রে। প্রথমে একটু উশখুশ ভাব আসে, সেটা শরীর মনের হঠাৎ পরিবর্তনের দরুন। সেটা থিতু হতে একটু সময় লাগে। তারপর একটানা কাজ আর দায়িত্ব পালন, মানে নিকটজনের প্রতিপালন। একটা একটা করে বছর চলে যায়, চুলে পাক ধরে, সবকিছু একটা বোঝা হয়ে উঠতে পারে আবার একটু ভালোবাসার মিশেল থাকলে হয়ে ওঠে আনন্দের। এই বর্ষায় তোদের জন্য আজ রান্না করছি খিচুড়ি। কেন এটা ভালো লাগবে জানিস? আমি ভালোবেসে দেব আর তোরা ভালোবেসে খাবি। রাঁধুনির হাতে তাই এমনটি হয় না—

ওঁর বয়স্ক ছেলেরা বা বউয়েরা মেয়ে - জামাইরা কখনও এভাবে ভেবে দেখেনি। কোনও একটা বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত ওঁর মধ্যে আছে। কথাগুলো অনায়াসে আর অমোঘভাবে বেরিয়ে পড়ে। রাতের খাওয়া - দাওয়া এলাহি। ওরা সব নানা দলে বিভক্ত হয়ে তুমুল তর্কাতর্কি জুড়ে দিয়েছে। গৃহকর্ত্রী সকলের জন্য অস্থায়ী রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করতে যাবেন, এমন সময় বুড়োদাদু, যিনি এখনও লাঠি ছাড়া হাঁটেন — দিব্যি ওদের সামনে চলে এলেন। খুকুদিদার দিকে তাকিয়ে বললনে— এ বাড়িতেও আজ আমি মশারি টাঙিয়েছি—

—চলো। বলে উনি উঠে পড়েন। এতক্ষণে মনে হয় খুকুদিদার গল্পটা মিথ্যে নয়। পরস্পরের বোঝাপড়া আর দায়িত্ব পালন— এসবই হচ্ছে মালমশলা, তাই দিয়ে ভালোবাসা তৈরি হয় নাকি। প্রথমে আসে ভালোবাসা, তারপর কর্তব্য ইত্যাদি। দর্শনে অনার্স রংলি ভাবে ঘোড়ার আগে গাড়ি না গাড়ির আগে ঘোড়া। ওরা এখনও মীমাংসায় পৌঁছতে পারে না। নিস্তেজ গলায় নেবু শেষে জিজ্ঞাসা করে —হ্যাঁ রে, বুড়োদাদু কত বছর মশারি টাঙাচ্ছেন বল তো?

—তা ষাট-পঁয়ষট্টি বছর তো হবেই।

—অ্যাঁ! তবে আর আমার হল না—

—কি? কি হল না?

মস্ত হাই তুলতে তুলতে নেবু বলে —প্রে-এ-এ-এম।